স্বদেশ

নিষ্ফল তদন্তের ফল আবারো গ্রেনেড হামলা

নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ খান লিখেছেন, *উই আর অ্যাংরি* – আমরা রাগান্বিত।
প্রথম আলো–র সম্পাদক মতিউর রহমানের লেখার শিরোনাম : *কিবরিয়া ভাইকে বাঁচতে দেয়া হলো না।*
দি ডেইলি স্টার–এর এডিটর মাহফুজ আনামের কমেন্ট : *ওয়ান বাই ওয়ান অপজিশন লিডার্স আর বিয়িং কিল্ড* – একের পর এক খুন হচ্ছেন বিরোধী নেতারা।
আমার দেশ পত্রিকার বিশেষ ভাষ্যে প্রবীণ সাংবাদিক আতাউস সামাদের প্রশ্ন : *কিবরিয়া সাহেবকে কেন এভাবে মরতে হলো?*

গত ২৭ জানুয়ারি সন্ধ্যা রাতে হবিগঞ্জ জেলার নিভৃত পল্লি বৈদ্যারবাজারে আধা রাজনৈতিক, আধা সামাজিক একটি অনুষ্ঠান শেষে বেরিয়ে আসার সময় আচমকা গ্রেনেড হামলায় নিহত হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রথম সারির একজন নেতা এবং এমপি শাহ এএমএস কিবরিয়া। এ আক্রমণে কিবরিয়া সাহেবের বড়ভাইয়ের ছেলেসহ আরো চারজন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন প্রায় শখানেক মানুষ। এই ঘটনা নিয়ে ২৯ জানুয়ারির দৈনিকগুলোর প্রথম পাতায় প্রকাশিত ওই মন্তব্য প্রতিবেদনগুলোতে যে ক্রোধ, আক্ষেপ, ক্ষোভ এবং প্রশ্ন ওঠে এসেছে তাতে সারা দেশের সচেতন মানুষদের আবেগ ও অনুভূতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

একই দিনে *দৈনিক ইনকিলাব*–এর প্রধান শিরোনামে ফুটে উঠেছে ওই গুপ্ত হামলার প্রতিক্রিয়ার ছবি। মূল শিরোনামটি হচ্ছে : *সংক্ষুব্ধ সারাদেশ।* নিচে সাব–টাইটেল – *রাজধানীতে ব্যাপক সহিংসতা : হবিগঞ্জে রেললাইন উৎপাটন, বিভিন্নস্থানে বিক্ষোভ–সমাবেশ।*

এ হামলার জন্য আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সরকারকে দায়ী করেছেন। ঘটনার প্রতিবাদে তারা প্রথম দিন হবিগঞ্জ জেলায় এবং পরে তিন দিন সারা দেশে একটানা হরতালের কর্মসূচি দিয়েছে। এই তিন দিনের মধ্যে সরকারকে পদত্যাগ করার আদেশ দিয়ে শেখ হাসিনা বলেছেন, কথা না শুনলে এরপর আরো শক্ত কর্মসূচি দিয়ে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য গভীর শোক এবং কঠোর ভাষায় হামলার নিন্দা করেছেন। হামলাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

প্রধান শাসক দল বিএনপির মহাসচিব ও মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর অভিযোগ এবং দাবি নাকচ করে দিয়ে উল্টো তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তদন্ত কাজে সহায়তা দিতে।

মি. কিবরিয়া বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক। তিনি সাবেক অর্থমন্ত্রী এবং বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় সরকারের আমলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। এসকাপ মহাসচিব ও জাতিসংঘ আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালনের কারণে তিনি আন্তর্জাতিক পরিচিতিও অর্জন করেছিলেন। মেধাবী, কৃতী ও সৎ মানুষ এবং একজন সুলেখক হিসেবে তিনি পরিচিতজনদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন নির্বাচিত এমপি এবং

একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের অন্যতম উপদেষ্টা। এ রকম একজন মানুষ খুন হলে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং সেটাই হচ্ছে। এতে সমাজের প্রতিটি মানুষ তার নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভীত হয়ে উঠবে এবং এর জন্য সরকারকেই দায়ী করবে, সেটাই স্বাভাবিক। এ ধরনের পরিস্থিতি ও পরিবেশ যারা সৃষ্টি করতে চায়, এটা যে তাদেরই কারো কাজ তা অনুমান করা যায়। কিন্তু তারা কারা? কি তাদের পরিচয়? তারা রাজনৈতিক, নাকি অরাজনৈতিক শক্তি? দেশি, নাকি বিদেশি? তারা ডানপন্থী, নাকি বাম? তারা কি সরকারের ভেতরের কেউ, নাকি বাইরের? সরকারের গোয়েন্দা ও তদন্ত সংস্থাগুলো কেন তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারছে না? এই ঘৃণ্য অপরাধীদের শনাক্ত করার কাজে কতোদিন লাগবে? নাকি কোনোদিনই তাদের খোজ পাওয়া যাবে না?

এই প্রশ্নগুলো এ কারণে উঠছে যে, কেবল কিবরিয়া সাহেবই নন, এর আগে বর্তমান সরকার আমলেই আওয়ামী লীগের আরো কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক এভাবে খুন হয়েছেন। এদের মধ্যে গাজীপুরের আহসানউল্লাহ মাস্টার ও খুলনার মঞ্জুরুল ইমামের মতো যারা স্থানীয় কোন্দল এবং স্বার্থের দ্বন্দ্বে খুন হয়েছেন তাদের হত্যাকারীরা শনাক্ত ও গ্রেফতার হলেও জনসমাবেশে বোমা হামলার মাধ্যমে যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটছে সেগুলোর কোনো সুরাহা হচ্ছে না। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকজন সাংবাদিক ও শিক্ষক সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত এবং আহত হয়েছেন। এর সবগুলো ঘটনার কূলকিনারা হয়নি।

প্রতিটি ঘটনার পর পরই আওয়ামী লীগ এবং তাদের সমর্থিত মিডিয়া ও সংগঠনগুলো এর জন্য সরকার অথবা ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠিকে দায়ী করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ঘটনাতেই এ অভিযোগের প্রমাণ মেলেনি। এ পর্যন্ত উদঘাটিত প্রতিটি ঘটনাতেই দেখা গেছে, হামলা হয়েছে স্থানীয় দ্বন্দ্ব কিংবা অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে।

তবুও সাধারণ মানুষের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দূর হচ্ছে না। তার কারণ হলো, গত কয়েক বছর ধরে দেশে চালু হয়েছে বোমা হামলার মাধ্যমে মানুষ হত্যার নৃশংস ধারা। আওয়ামী লীগ শাসন আমলে যশোরে *উদীচী*-র গানের আসরে বোমা হামলা, খুলনায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে বোমা হামলা, ঢাকায় রমনার বটমূলে ছায়ানট-এর নববর্ষবরণ উৎসবে বোমা হামলা, পল্টন ময়দানে সিপিবি-র সমাবেশে বোমা হামলা, বানিয়াচঙ্গের গির্জায় বোমা হামলা, নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ অফিসে এবং বাগেরহাটের জনসভায় বোমা হামলায় অনেক লোক হতাহত হয়েছিলেন। এর একটি ঘটনারও রহস্য আওয়ামী লীগ সরকার উদঘাটন করতে পারেনি। কাজেই বর্তমান সরকার পদত্যাগ করলে কিংবা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসতে পারলেই যে বোমা হামলা বন্ধ হবে কিংবা এর রহস্য উদঘাটিত হবে এমন দাবি বিশ্বাস করা যায় না।

২০০১ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার বদল হলেও জোট সরকার অতীতের বোমা হামলাগুলোর কোনো সুহারা করতে পারেনি। বোমা হামলাও বন্ধ হয়নি। এ সরকারের আমলেই সার্কাসে, মেলায়, সিনেমা হলে, যাত্রা গানের আসরে, পীরের মাজার ও দরগায় এবং জনসমাবেশে বোমা হামলায় অনেকে মারা গেছেন, আহত হয়েছেন। বরং বিপদ আরো বেড়েছে। সেটা হলো এখন হামলায় বোমার বদলে আরো মারাত্মক বিধ্বংসী অস্ত্র গ্রেনেড ব্যবহার করা হচ্ছে। আর হামলার টার্গেট হচ্ছেন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা।

এর আগে সিলেটে হযরত শাহজালালের মাজার জিয়ারত করতে গিয়ে গ্রেনেড হামলায় বৃটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী আহত হন। ঢাকায় শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড ফাটিয়ে অনেককে হতাহত করা হয়েছে। দলের প্রথম সারির নেত্রী আইভি রহমানও এতে মারা যান। এই দুটি ঘটনা কারা ঘটিয়েছে তা আজ পর্যন্ত উদঘাটন করা যায়নি। সরকার নিজস্ব তদন্তের পাশাপাশি বৃটিশ পুলিশের *স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড,* আমেরিকান তদন্ত সংস্থা *এফবিআই* এবং আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোল-এর সহায়তা নিয়েছে। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি। দুটি ঘটনা আজও রহস্যের আবরণেই ঢাকা রয়ে গেছে। হবিগঞ্জের ঘটনার ব্যাপারেও একই ভাবে বিদেশি সহায়তা চাওয়া হয়েছে। তবে এতেও কোনো সুফল আসবে কি না তা নিয়ে রয়ে গেছে ঘোর সংশয়। আমাদের দেশের নিরাপত্তা এবং তদন্ত ব্যবস্থার দুর্বলতা ও ত্রুটি সম্পর্কে সকলেই জানে এবং এর ওপর নাগরিকদের তেমন আস্থা নেই। দক্ষতার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সংস্থাগুলোও তেমন কোনো সাফল্য দেখাতে না পারায় সকলেই হতাশ হচ্ছে।

এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে এর আগে কৈফিয়ত হিসেবে দুটি বক্তব্য এসেছে। প্রথমত. বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোতেও এ ধরনের গুপ্ত হামলার রহস্য উদঘাটনে খুব বেশি সাফল্য নেই।

এই দায়সারা কৈফিয়ত সম্পর্কে বলা যায় যে, উন্নত দেশের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক এবং তাদের ব্যবহার করা প্রযুক্তি ও কৌশলের সঙ্গে বাংলাদেশের দুর্বৃত্ত এবং সমাজ বিরোধীদের তুলনা চলে না। দেশীয় নিরাপত্তা ও তদন্ত জালকে ফাকি দিতে পারলেও বিশ্বখ্যাত সংস্থাগুলোর অনুসন্ধানী চোখ এড়ানোর সামর্থ এদের থাকার কথা নয়।

সরকারের দ্বিতীয় কৈফিয়ত হচ্ছে, তদন্ত কাজে সংশ্লিষ্টদের সহায়তা পাওয়া যায় না। এটাও কোনো সুযুক্তি হতে পারে না। তদন্তে যার সহায়তা দরকার তিনি যতো শক্তিশালীই হোন না কেন, তাকে সহায়তা দিতে বাধ্য করার মতো আইন সরকারের হাতে আছে। সে আইন প্রয়োগে বাধা কোথায়?

এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলের অভিযোগ, সরকার আগেই আলামত নষ্ট করে ফেলে বলে বিদেশি তদন্তকারীরা এসে সফল হতে পারে না। এর আগে এই অভিযোগ অসত্য প্রমাণিত হয়েছে।

তাদের আরেকটি অভিযোগ, সরকারের কাছ থেকে সঠিক সহযোগিতা না পাবার কারণে ব্যর্থ হয়েছে বিদেশি তদন্ত। কিন্তু বিদেশি তদন্তকারীরা এর আগে নিজেরাই জবাব দিয়ে বলেছেন যে, এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

তাহলে বিদেশি তদন্তের কেন এই ব্যর্থতা? এর দুটি কারণ থাকতে পারে।

এক. বিদেশি তদন্তকারীরা রহস্য উদঘাটনের ব্যাপারে আন্তরিক নয়। তারা চায় রহস্যটা থেকে যাক। তাহলে বাংলাদেশে মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠি গোপনে বাড়ছে বলে যে প্রচারণা রয়েছে সেটা জারি থাকবে। এই সুযোগে বাংলাদেশকে নানানভাবে চাপে রাখতে সুবিধা হবে।

দুই. ঘটনার আগে-পরে সংঘবদ্ধ ও জোরালো প্রচারণার মাধ্যমে যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয় তাতে প্রকৃত অপরাধীরা আড়াল হয়ে যায়। প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে বাংলাদেশের প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বিদেশি তদন্তকারীরাও ভুল টার্গেট লক্ষ্য করে এগোতে গিয়ে কিছুই হাতড়ে পান না।

মি. কিবরিয়ার নির্মম হত্যাকাণ্ড তদন্তের ভাগ্যেও যাতে তেমনটি না ঘটে সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

হবিগঞ্জের গ্রেনেড হামলার আগে দেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। র‍্যাব ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অন্যান্য বাহিনীর সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। সমাজে শান্তি ও স্থিতি এবং জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছিল। এতে সরকারের জনপ্রিয়তা অনেকগুণে বেড়ে যায়। আওয়ামী লীগ চেষ্টা করেও সরকার বিরোধী তেমন কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছিল না। সমমনা অন্যান্য দলের সঙ্গে তাদের ঐক্যের উদ্যোগেও ভাটা পড়েছিল হরতাল ও অন্যান্য ইসুতে। এতে দলের মধ্যে হতাশা নেমে এসেছিল এবং বেড়ে গিয়েছিল অভ্যন্তরীণ কোন্দল। এই পরিস্থিতিতে হবিগঞ্জে গ্রেনেড হামলায় কিবরিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় আওয়ামী লীগ একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে হারিয়ে একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অন্যদিকে লাভবান হয়েছে আন্দোলনের একটি জোরদার ইসু খুজে পেয়ে। এখন হতাশা ও কোন্দলকে পাশ কাটিয়ে দল চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। হরতালে সমমনা দলগুলোর সমর্থনও পেয়েছে তারা। শেখ হাসিনা দাবি তুলেছেন, কিবরিয়াকে হত্যার বিচার তারা এ সরকারের কাছ থেকে চান না। সরকারকে আন্দোলনের মাধ্যমে উৎখাত করেই তারা হত্যার বদলা নেবেন।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হবিগঞ্জে হামলা ও হত্যার ঘটনাটিকে আওয়ামী লীগ দলীয় ইসুতে পরিণত করতে আগ্রহী। তারা এ ইসু থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চায়। কিন্তু বোমা ও গ্রেনেড হামলার ধারা চিরতরে বন্ধ করতে হলে এখন প্রয়োজন ঘটনার রহস্য উদঘাটন। তদন্তের ধারাবাহিক ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য প্রয়োজন এই ইসুটিকে জাতীয় ইসুতে পরিণত করা। কেবল বিবৃতি দিয়ে নয়, বিএনপিসহ অন্যান্য দলের উচিত দেশব্যাপী সমাবেশ করে এ ধরনের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানানো। এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। হিংসা, হানাহানি, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেই কেবল এ ইসুকে জাতীয় ইসুতে পরিণত করা সম্ভব।

এই ঘটনার রহস্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে ঘটনার পটভূমিও বিবেচনায় রাখা দরকার। ঘটনাটি ঘটলো বাংলাদেশে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের নির্ধারিত তারিখের অল্প কয়েকদিন আগে। জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশনকে সামনে রেখেও ঘটলো এই হামলার ঘটনা। এর আগে শেখ হাসিনার সভায় গ্রেনেড হামলা এবং আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যার ঘটনাও পার্লামেন্ট অধিবেশনের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল। তাছাড়া দেশের বাইরে আলোড়ন সৃষ্টি হবে এমন ব্যক্তিদেরকেই হামলার টার্গেট করা হচ্ছে। ঘটনার ঠিক আগে এবং পরে দেশে-বিদেশে এই মর্মে ব্যাপক প্রচারণা শুরু হয় যে, বাংলাদেশে ধর্মান্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠি দানবীয় শক্তি অর্জন করেছে। হবিগঞ্জে হামলার আগেও ঠিক তাই হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাও প্রায় প্রতিটি ঘটনাই অলৌকিকভাবে আগাম টের পেয়ে যান। তিনি বলতে থাকেন, আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের বেছে বেছে হত্যার নীল নকশা করা হয়েছে। সরকার এবং স্বাধীনতা-বিরোধীরা বসে লিস্ট করেছে। তার এই ঘোষণার পর পরই ঘটনা ঘটে। কিন্তু আগাম জেনে যাওয়া সত্ত্বেও ঘটনা ঘটার পর তিনি কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেন না। কিবরিয়া খুন হওয়ার আগেও শেখ হাসিনা হত্যার নীল নকশার কথা কয়েকদিন ধরেই আগাম বলছিলেন। হবিগঞ্জ হামলার পর তিনি বলেন, দুই-এক দিনের মধ্যে তার ওপরেও হামলা হতে পারে এবং এ খবর আর্মস্টারডাম থেকে তাকে জানানো হয়েছে।

কিবরিয়া বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত একটি ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে খুন হয়েছেন। সেখানে রাত সাতটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চালানো হয়। কিবরিয়ার বিধবা পত্নী আসমা কিবরিয়া দৈনিক মানবজমিনকে জানিয়েছেন, তিনি স্বামীকে নিষেধ করে বলেছিলেন, *হবিগঞ্জ যেও না, জায়গা ভালো না। তোমার আর নির্বাচন করার দরকার নেই।* জবাবে কিবরিয়া বলেন, *নেত্রীর নির্দেশ, আমাকে বাধা দিও না* (দৈনিক মানবজমিন, ২৯ জানুয়ারি ২০০৫)।

বৈদ্যেরবাজারের মতো নিভৃত জায়গায় এ রকম একটি অনুষ্ঠান এমন কি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়ে কিবরিয়াকে ঢাকা থেকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন? অথচ হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু জাহির পর্যন্ত এ অনুষ্ঠানের সংবাদ জানতেন না। হামলায় আহত জাহির একই তারিখে মানবজমিন-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বলেছেন, *বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শাশুড়িকে দেখার জন্য বৃহস্পতিবার রাতেই ঢাকায় আসার কথা ছিল। টিকিটও কেটেছি। তবে বুধবার দুপুরে সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া ফোন করে জানান বৈদ্যেরবাজারের সভার কথা।*

তার অর্থ, ইউনিয়ন লেভেলের এ অনুষ্ঠানের সংবাদ জেলা পর্যায়ে অজানা থাকলেও কেন্দ্রের জানা ছিল।

আরো দুটি বিষয় জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার। এই সভা সম্পর্কে আয়োজনকারীরা আগে পুলিশকে কিছু জানায়নি। ঘটনার পর পুলিশ সুপার স্থানীয় পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান সহিদউদ্দিন চৌধুরীসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে জানিয়েছিলেন আহতদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত ঢাকায় নিতে হেলিকপ্টার পাঠানোর সরকারি প্রস্তাবের কথা। কিন্তু তারা হেলিকপ্টারের অপেক্ষা না করে আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন।

হেলিকপ্টারে দ্রুত ঢাকায় আনতে পারলে হয়তো রক্তক্ষরণে কিবরিয়ার মৃত্যু ঘটতো না।

আশরাফ লতিফ

২৯ জানুয়ারি ২০০৫

এনজিও কারবারে জবাবদিহিতার প্রশ্ন

অ্যাডভোকেসির এক চেটিয়া উদ্দেশ্য হলো মানব অধিকার। সেটা লিঙ্গ, জাতিগত পরিচয় বা সংখ্যালঘুতা ভিত্তিক বৈষম্য ও বঞ্চনার ফলে সৃষ্ট মানব অধিকার লঙ্ঘনই হোক আর রাজনীতিসহ এ জাতীয় অন্যান্য যেকোনো ইসু ভিত্তিক বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট মানব অধিকার লঙ্ঘনই হোক, গত দেড় দশক ধরে তা এনজিওগুলোর নিজস্ব সম্পত্তি। তবে নামের অর্থ মেনে এটির কর্মকাণ্ড এখন স্বেচ্ছাসেবা ভিত্তিক নেই। এটা এখন এস্টাবলিশমেন্টের নিপীড়ন বা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলোর দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক লড়াইও নয়। শেখ মুজিবর রহমানের পতিত একদলীয় শাসনের দানবীয়তার পরিণামে প্রথম বছরগুলোর আধা-ফ্যাসিবাদ এবং আইনের শাসন ও সাংবিধানিকতার অনুপস্থিতির কথা আমাদের মনে আছে। এই লড়াই প্রথমটায় সহজ ছিল না, সহৃদয় দাতাদের পৃষ্ঠপোষকতাও বর্ষিত হতো না। আজকের দিনে মানব অধিকার হলো যেকোনো কনফারেন্সের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মাঝে মধ্যে বিষয়টি মেট্রপলিটান দাতা দেশ ও সংস্থার সুমিষ্ট, ভারী মুষ্টিভিক্ষায় লালিত-পালিত অজস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের

মুখরোচক বিষয়ে পরিণত হয়। আরো মজার বিষয় হচ্ছে, আজকাল বিপুল পেশাদার মানব অধিকারজীবী এসব অনুদানের টাকায় জীবিকা নির্বাহ করছেন। রাজনীতি, গণমাধ্যম ও ব্যবসায়ও ঢুকে পড়ছেন।

বার্লিন দেয়ালের পতন এবং যে বিশাল রাষ্ট্রে মানব অধিকার কেবল দলীয় নেতৃবৃন্দের প্রাপ্য ছিল সেই সভিয়েট ইউনিয়নের বিলোপের পর এটির পোষ্য দল ও দেশ এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকান পোষ্যদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানব অধিকারই হচ্ছে সেই এলাকা যেটার পেছনে দেদার অর্থ ঢালা হচ্ছে। ক্রেমলিনের উৎস শুকিয়ে যাওয়ার পর এর অধীন নেটওয়ার্কগুলো দ্রুত পক্ষ ছাড়ছে। এই আশীর্বাদ ও ক্ষেত্র বিশেষে ফাও অনুগ্রহ লাভে যারা দারুণ আগ্রহী তারা অযাচারী সমাজ হিসেবে সুপরিচিত এই সমাজের ভেতরে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য সুরক্ষিত করার চেষ্টাকারী এক বিশেষ গোষ্ঠিতে পরিণত হয়েছে। আপনারা কেবল অ্যাডভোকেসি এনজিও ব্যবসার হর্তাকর্তাদের নামের তালিকাটা লক্ষ্য করুন, দেখতে পাবেন প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানির মতোই এদেরও গুটিকয়েক বংশানুক্রমিক চেহারা। এদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে কয়েকজনই প্রায় সবগুলো বোর্ড অফ ট্রাস্টিতে রয়েছেন।

তাতে অবশ্য আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। দাতারা তাদের অর্থের শ্রাদ্ধ করতে চাইলে কার কি করার আছে! কিন্তু যা সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ এবং যা বাধ্যতামূলক, আমি আবার বলছি যা সত্যি বাধ্যতামূলক তা হলো, এ সব অ্যাডভোকেসি এনজিওর কাফেলাকে জবাবদিহিতার বাইরে থাকতে দেয়া যায় না। কেননা এরা মাঝে মধ্যেই সীমারেখা ডিঙিয়ে দলীয় রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে এবং একদা অধিকার বিরোধী, বহুত্ববাদ বিরোধী প্লাটফর্মের অগ্রদূত থেকে এখন ভোল পাল্টে ফেলা দলীয় হোমড়া-চোমড়াদের একটা নেটওয়ার্কে পরিণত হচ্ছে। যেসব সরকারি অডিটে দাতাদের তহবিলের যথেচ্ছ অপব্যয় ও ব্যক্তিগত সম্পদ গড়ে তোলার তথ্য পাওয়া যায়, দুর্ভাগ্যবশত এই আতাত সেসব অডিট নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এনজিও বিলিয়নেয়ার প্রশিকার ফারুক আহমদের ক্ষেত্রে এমনটা দেখা গেছে। তিনি তার অর্থ কুকুর ও মানুষের পেছনে খরচ করেছেন।

দাতাদের অর্থের প্রদায়ক ও গ্রাহক অংশের মধ্যে কোনো আতাতের ইঙ্গিত না করলেও এ ঘটনার ব্যাপারে সরকারের আকস্মিক স্মৃতি বিভ্রম এবং সেই অডিট রিপোর্টের ব্যাপারে কোনো রকম ফলোআপ পদক্ষেপের অনুপস্থিতি আমাদের হতবাক করে। আমরা যতোদূর জানি, আন্তর্জাতিক অডিটের ব্যাপারে প্রশিকার স্থানীয় মিশনের অনুরোধ এটির প্রধান দাতা দেশ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা চেয়েছে এই এনজিওর প্রকল্পগুলোর সুবিধাভোগীরা যাতে কোনো একক ব্যক্তির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সেই সঙ্গে তারা চেয়েছে অটোমেটিক রিভার্শনের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তাদের অর্থ ছাড় করে দিক এনজিও বুরো। অডিট রিপোর্ট এবং অর্থ ছাড়করণ এ দুইয়ের ব্যাপারে এখন সরকারের কি বক্তব্য?

যেহেতু আমাদের মতো দেশে সরকার হয় গোপনীয়তাপ্রিয়, সে কারণে দাতাদের নানান ঢাক-ঢাক গুড়গুড়ের ব্যাপারে নীরব থাকার এই অভ্যাস আমাদের ছাড়তে হবে। ছাড়তে হবে তাদের কিছু পোষা এনজিও বা তাদের কৃপাজীবীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না তোলার অভ্যাস। দাতা সংস্থা ও সরকারের প্রতি তাদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে। দুর্নীতির ক্ষেত্রে এক হাতে তালি বাজে না। দুর্নীতি কোনো একক কর্মকাণ্ড নয়। আশা করি, তহবিল দাতা এবং গ্রহিতা উভয়ই আমার ইঙ্গিত ধরতে পেরেছেন। তাদের সূচকের তাৎপর্য যা-ই হোক না কেন,

দুর্নীতি ও তহবিল তছরুপ শুধু ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বিষয় নয়। দুর্নীতি এমন ব্যাপক আর সর্ববিসারী হয়ে উঠেছে যে, এমনকি সম্পদ মোবিলাইজেশনও দুর্নীতি, তছরুপের অভিযোগের বাইরে নয়। স্মরণ করুন তৎকালীন বিনিময় হারে প্রাপ্ত দুই বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের ত্রাণ সাহায্যের কথা। শেখ মুজিবের আমলে যুদ্ধউত্তর পুনর্গঠন কর্মকাণ্ডের প্রথম বছরেই ত্রাণের গমসহ অন্যান্য খাদ্য এবং সেই প্রবাদ প্রতীম কম্বল খোলা বাজারে বিক্রি হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের সফররত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেংমান ঝাংয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানটির কান্ট্রি ডিরেক্টর কৃস্টিন ওয়ালিক আমাদের কয়েকজন সাংবাদিকদের চায়ের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দৈবক্রমে সেখানে, বিশেষ করে এনজিওদের জবাবদিহিতা, পিআরএসপি, প্রবৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় চলে আসে। চায়নার নাগরিক ঝাং স্বভাবতই বাংলাদেশ সম্পর্কে সকল উপাত্ত সংগ্রহ করে নিয়েছেন তার কান্ট্রি ডিরেক্টরের কাছ থেকে। তিনি স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণের ব্যাপারে বাংলাদেশের বিপুল প্রশংসা করলেন। সেই সঙ্গে জানালেন, প্রবৃদ্ধির হার এবং মানব উন্নয়নের কয়েকটি প্রধান গুণগত ক্ষেত্রে, বিশেষত ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র হ্রাস সংক্রান্ত জাতিসংঘের বেধে দেয়া লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ সবগুলো না হলেও অধিকাংশ অশিল্পায়িত দেশের চেয়ে ভালো করছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি আরো বাড়ানোর পথে প্রধান বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে সরকারের অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের আকার ও দক্ষতা এবং রাজনৈতিক নেতাদের কর্মকাণ্ড। এরা মিলে রাষ্ট্রের রাজস্ব বাজেট গপাগপ খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়। উন্নয়ন তহবিলও এরা কুড়ে খায়। মহাহিসাব নিরীক্ষকের মতো একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও এরা কোনো অডিট সহ্য করে না। মহাহিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয়কে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্য পূরণ এখনো বহু দূরবর্তী। এদিকে এরই মধ্যে দাবি উঠেছে, আইন করে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়কে অডিট থেকে নিষ্কৃতি দিতে হবে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রেই যথেচ্ছাচার আর কোটারি স্বার্থের একচেটিয়াত্ব সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

বিশ্ব ব্যাংকের নাম্বার টু কর্মকর্তা শেংমান ঝাং অবশ্য মনে করেন, সুশাসনের দুর্বলতাগুলো একটু বাড়িয়ে দেখানো হয়। এর প্রাথমিক কারণ হলো সরকারি খাত সংস্কারের একাধিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সরকারের বিশাল আকার এবং এটির হতাশাজনক মান। এটা যে সংস্কার করা সম্ভব হবে, আমাদের মনে সে আশা সহসা জাগে না। তবে বিশ্ব ব্যাংকের এমডি এবং তার কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মনে করেন, আমলাতন্ত্রের আকার ছোট করে আনা ও এটির দক্ষতা কার্যকরভাবে বাড়ানো সম্ভব। এর বিশদ উপায় আছে। সরকারের আকার দিনে দিনে বাড়লেও এবং দক্ষতা শূন্যের কোঠায় নেমে গেলেও এ লক্ষ্য পূরণ অসম্ভব নয়।

এনজিও এবং জিও নিয়ে অনেক কথাই বলা হলো। এ দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টিই সব সময় যে সবচেয়ে বেশি খারাপ তা নয়। সুশাসন এখন এক এনজিও কারবার। মানব অধিকারও তাই। জাতিসংঘ অনুমোদিত ২০০৫ সালে ক্ষুদ্র ঋণের কি হবে? আমরা কি মারহাবা-মারহাবা ডাক ছাড়বো?

(২১ জানুয়ারি ২০০৫-এর নিউ এজ-এ প্রকাশিত লেখার অনুবাদ)

এনায়েতউল্লাহ খান

সম্পাদক, নিউ এজ